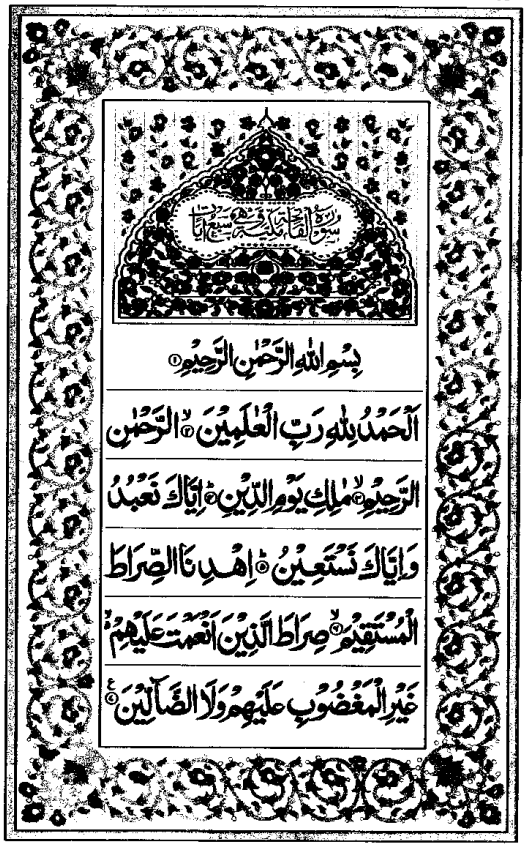
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত সাত।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা আল-ফাতিহা

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য : সূরা আল-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমতঃ এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইকরা', 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রাঃ) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধহয় এই যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এ সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরা-ফাতিহা' এদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে। কোরাআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানতঃ ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রূহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন', 'উম্মুল কিতাব', 'কোরানে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। – (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পূর্বঘোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে— যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যাবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে— সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। — (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, — সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ — (কুরতুবী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ কোরআনের একটি আয়াত ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কোরআন শরীফের সূরা নাম্‌লের একটি আয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয়। بِسْمِ اللّٰهِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নাম্‌ল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্‌সহ আরম্ভ করার আদেশ ঃ জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিব্রাঈল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্‌র নামে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রসূলে করীম (সা:)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ باسمك اللهم বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

— (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে আরম্ভ কর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "যে কাজ বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।"

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। — (কুরতুবী)

বিসমিল্লাহ্‌র তফসীর ঃ বিসমিল্লাহ্ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমতঃ 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত: 'ইসম' ও তৃতীয়ত : 'আল্লাহ'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক — সংযোজন। অর্থাৎ, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই— এস্তেয়ানাত — অর্থাৎ , কোন বস্তুর সাহায্য নেয়া। তিন— কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

'ইসম' শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' নামকে বলা হয়। 'আল্লাহ্' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলেম একে ইসমে আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্ এক; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণাবলীর এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে 'বা'- এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

তাআব্বুজ শব্দের অর্থ اعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم পাঠ করা।

আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে— যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়তঃ কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ'উযুবিল্লাহ্ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ নয়। তেলাওয়াত কালে উভয়টি পাঠ করা সুন্নত। তবে একটি সূরা শেষ করে শুধুমাত্র সূরা তওবা ব্যতীত অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয় তখন আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত আসলে তখন বিসমিল্লাহ্ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। - (আলমগীরী)

'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম', কোরআনের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময়, (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না জায়েয। তবে কোন কাজ কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা—পানাহার) দোয়ারূপে পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু ঃ সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া মিশ্রিত।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেছেন যে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন — নামায (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেয়া হবে। অতঃপর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন,এ আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয রয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্ বলেন, এসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। – (মাযহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার)। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয়।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই বর্তায়। যেমন, কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ ব্যাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এসব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টবস্তুর উপাসনাই নিষিদ্ধ করা হলো। তাছাড়া এ দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এক-ত্ববাদের শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। আল-কোরাআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করতঃ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম 'রাব্বুল আলামীন'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় رَبٌّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বুঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

الْعٰلَمِيْنَ শব্দটি عـالـم শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা— আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বিন, জমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উর্ধ্বে নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্টবস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহ্র ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ – এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ –এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –এ তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ رحمٰن ও رحيم শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই 'গুণের আধিক্যবোধক বিশেষণ' যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বুঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবতঃ এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহ্মত বা দয়ার তাগিদেই করেছেন। যদি

সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই, আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ –এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। دين অর্থ প্রতিদান দেয়া। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর শাব্দিক অর্থ প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ, প্রতিদান – দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে 'আম' বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান-দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে থাকবে।

প্রতিদান-দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রথমতঃ প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রতিদান-দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে; সুতরাং প্রতিদান-দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, প্রতিদান-দিবস সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং এটি হল কর্মস্থল; কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহ্র অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেহ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এ জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বপেক্ষা বেশী বিপদাপদে পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ— প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়; গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর; মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, বরং পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক অল্লাহ্ তাআলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য কি? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তাআলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তারীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্র একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তারীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহোত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও প্রর্থনা। نَعْبُدُ — عبادت শব্দ থেকে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। نَسْتَعِيْنُ — استعانت হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।' মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এবং الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে

তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। অতঃপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর মধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

প্রথম তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফলকথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই اِيَّاكَ نَعْبُدُ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং নিজের যাবতীয় কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই প্রার্থনা করবে। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্র তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, 'আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।' কিন্তু কোন্ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাসসিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ'ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্খায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

শুধু নামায রোযারই নাম ইবাদত নয়। ইমাম গাযযালী স্বীয় গ্রন্থ আরবাঈন-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা - নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কাকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্খা পোষণ আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্খার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহ্র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা- যথা রুকূ বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনাপদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে —

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থাৎ, 'আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দারা চলেছে সে পথ নয় এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন, সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, তেমনি আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও বটে। নিঃসন্দেহে যাঁরা হেদায়েত প্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল।

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরাআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে— 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা'। তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড়পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায়?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতঃই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি

ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

অর্থাৎ— এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্র প্রশংসার তসবীহ্ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অর্থাৎ, — 'তোমরা কি জান না যে, আসমান-জমিনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষতঃ পাখীকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া তসবীহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ তা'আলাও ওদের তসবীহ্ সম্পর্কে খবর রাখেন।'

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তারীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শর'য়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথায়ও আধুনিক কালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা— জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, মানবমন্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ আয়াতে করা হয়েছে।

অর্থাৎ, যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেযাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা — মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বোঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও চলে না।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ, সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ — মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখান করে কাফির- বে-দ্বীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্মভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ, এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছেঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ — 'যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।' এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় ওলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এজন্যই সূরা আল-ফাতেহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাতাহ্তে মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا অর্থাৎ, মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে,যাতে সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না ; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

(এক) পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতেকরে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ

আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(দুই) আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তরও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

(তিন) হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ অর্থাৎ, আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না — এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়া কোনটিরই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের ন্যায়, কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে -'আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।'

সরল পথ কোনটি? 'সোজা সরল রাস্তা' সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে 'ইফরাত বা 'তফরীত এর-অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেয়া। এরশাদ হয়েছে ঃ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

অর্থাৎ — যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্র দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে 'আওলিয়া' বলা হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন যাঁরা ওয়াজিব-মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী। সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দ্বীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে ইতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থাৎ, যারা আপনার অভিসম্পতগ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহ্কামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমীকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضالين - তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপরে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা-নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে এমনি বাড়াবাড়ি করেছে যে, নবীদিগকে আল্লাহর স্থানে উন্নীত করে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নবীদের কথা মানেনি; এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। অপরদিকে নাসারাগণের বেলায় অতিরঞ্জন হচ্ছে এই যে, তারা নবীদিগকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে— আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতেহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এই দোয়া— 'হে আল্লাহ্! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন। কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুতঃ সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকূতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

দোয়া করার পদ্ধতি ঃ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকূতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাকেই এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশের জন্য আরযি পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন

কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্খলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর তা'রীফ- প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেয়া।

আল্লাহ্‌র তা'রীফ-প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ঃ এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহ্‌র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণতঃ কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার দেহই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার দেহ যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি দেহ ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার দেহ হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়া-চড়া করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন— نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ অর্থাৎ, 'আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।' এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে তা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্তুর বছর বা এর চাইতে অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই চিন্তা করলে দেখা যাবে, এতে আল্লাহ্ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে; সারা জীবন সাধনা করেও এ রহস্যটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বুঝা যায়, চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। এমনিভাবে কান, জিহ্বা, হাত ও পায়ের যত কাজ এতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-জমিন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য; যথা — আকাশ, বাতাস, জমিন এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নেয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা, আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য যে, মানবজীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্ব প্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে اَلْحَمْدُ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ ও প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এ শব্দ তা অপেক্ষা অনেক উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে, তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার اَلْحَمْدُ বলা অপেক্ষা অতি উত্তম।— (কুরতুবী)

কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শফীক ইবনে ইব্রাহীম اَلْحَمْدُ -এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে জানো এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের দেহে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার নিকটেও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ الله –এর সাথে لام বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস لام বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বুঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তারীফ- প্রশংসাই মানবের কর্তব্য। বরং এ তারীফ- প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তব পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ-প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহ্সানকারীর শুকরিয়া আদায় করে না সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারও শুকরিয়া করে না।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ – এর অর্থ মুফাসসিরকুল— শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না।— (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতেহা কোরআনের সারমর্ম এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ সূরা আল-ফাতেহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে।

(এক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয় : ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া, যা আল্লাহ্র জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্য করণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম নির্ধারণের যোগ্যতাও রাখে না; এ জন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃত পক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ্র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেঃ

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, 'যদি আল্লাহ্র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।'

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করাও শিরক। প্রয়োজন মিটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যেসব কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন,— ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস পরিহিত অবস্থায় রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযুর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা থেকে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রসূল (সাঃ) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে কারো প্রতি রুকূ বা সেজদা করা, বাইতুল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে করা হয়েছে।

কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না। যথা— প্রস্তুকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে ব্যাধ্য। এরূপ সাহায্য নেয়া কোন ধর্মমতে বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়। অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক— আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া, — এটি প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই — সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে,

প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহতায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মুমিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তার কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ নিজেই তো ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে; যথা, মু'জেযা। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বুঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা,— এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

বদরের যুদ্ধে রসূল (সাঃ) শত্রুসৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রু, শত্রুসৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জেযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।' এতে বুঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জেযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্রই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ মু'জেযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে আসবে। তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ, 'কোন মুজেযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।' তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জেযা বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এরূপ ক্ষমতা কাউকেই দেয়া হয়নি।

রসূল ও অন্যান্য নবিগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জেযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্ব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েতই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারিত করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যেই নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মুমিনের এ দোয়া তসবীহ্স্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

সূরা আল ফাতেহা সমাপ্ত